بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১০ জানুয়ারি, ২০২৫ মোতাবেক ১০ সুলাহ্, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবার পূর্বে মহানবী (সা.)-এর যুগের সেনাভিযান ও যুদ্ধের বর্ণনা চলছিল। তাতে বনু ফাযারার অভিযানের উল্লেখ করা হয়েছিল। ইতিহাসে বনু ফাযারা গোত্রের বিরূদ্ধে পরিচালিত অভিযানে একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা উম্মে কিরফার হত্যা সংক্রান্ত। কিছু ইতিহাসবিদ এই ঘটনাটিকে যেভাবে লিখেছেন, তা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, এটি একটি অবাস্তব কথা। 'তাবাকাতুল কুবরা'-তে লেখা হয়েছে, হযরত যায়েদ বিন হারেসা ষষ্ঠ হিজরী সনে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তার সাথে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের বাণিজ্যিক পণ্য ছিল। তারা যখন ওয়াদিউল কুরা-র নিকট পৌঁছেন তখন বনু ফাযারা গোত্রের শাখা বনু বদর-এর কিছু লোকের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়, যারা তাকে ও তার সাথিদের মারধর করে আর তাদের কাছে থাকা সমস্ত মালপত্র ছিনিয়ে নেয়। এরপর হযরত যায়েদ যখন সুস্থ হয়ে ওঠেন আর তিনি মহানবী (সা.) সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে (সা.) এই ঘটনার সংবাদ প্রদান করেন, তখন মহানবী (সা.) তাকে (একটি বাহিনীসহ) আক্রমণকারীদের প্রতি প্রেরণ করেন। মুসলমানরা দিনভর লুকিয়ে থাকত আর রাতে সফর করত। কিন্তু বনু বদর গোত্রের লোকেরা তাদের (আগমনের) এই বার্তা পেয়ে যায়। এরপর হযরত যায়েদ ও তার সঙ্গীরা সকালবেলা সেই লোকদের কাছে পৌঁছেন। তারা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চকিত করেন এবং সেখানে উপস্থিত সবাইকে ঘেরাও করেন। উম্মে কিরফাকে, যার আসল নাম ছিল ফাতেমা বিনতে রবী'য়া বিন বদর এবং তার মেয়ে জারিয়া বিনতে মালিক বিন হুযায়ফা বিন বদরকে গ্রেফতার করেন। জারিয়াকে হযরত সালামা বিন আকওয়া গ্রেফতার করেন এবং মহানবী (সা.)-এর হাতে তুলে দেন। মহানবী (সা.) এরপর তাকে হাযম বিন আবি ওয়াহাবের জন্য দান করেন।

এ বিষয়ে ইতিহাসের কতক পুস্তকে উম্মে কিরফার হত্যার ঘটনা, যেমনটি আমি বলেছি, অদ্ভুতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের আলোকে মেনে নেওয়া অসম্ভব। যাহোক, কতক বইয়ে লেখা আছে যে, কায়েস বিন মুহাসসের উম্মে কিরফাকে (হত্যার) সংকল্প করেন। সে একজন বৃদ্ধা নারী ছিল। কায়েস তাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করেন। তার দুই পায়ে দড়ি বেঁধে দুইটি উটের সাথে বেঁধে দেন আর এরপর উটগুলোকে হাঁকিয়ে দিলে সেগুলো দৌড় দেয় এবং সেই নারীকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। কায়েস আরো দুই ব্যক্তিকেও হত্যা করেন। হযরত যায়েদ বিন হারেসা নিজের এই অভিযান শেষে ফিরে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর দরজায় কড়া নাড়েন। তিনি (সা.) নিজের কাপড় ঠিক করে যায়েদের উদ্দেশ্যে বের হন এবং যায়েদকে আলিঙ্গন করেন ও চুমু দেন এবং যায়েদের কাছে খবরাখবর জিজ্ঞেস করেন। আল্লাহ্ তা'লা যায়েদকে যে বিজয় দান করেছেন সে সম্পর্কে তিনি মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন।

এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাকে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এই ঘটনার বর্ণনা খুব যুক্তিসজ্জিত করে সুন্দরভাবে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

হযরত আবু বকরের অভিযানের স্থলে, যার উল্লেখ এখনই করা হয়েছে, ইবনে সা'দ এমন একটি অভিযানের উল্লেখ করেছেন যার আমীর ছিলেন যায়েদ বিন হারেসা। অর্থাৎ ইবনে সা'দ এ অভিযানে হযরত আবু বকর (রা.)-র স্থলে হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে আমীর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে কিছুটা দ্বিমত করে লেখেন, এই অভিযান বনু ফাযারাকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল, যারা ওয়াদিউল কুরা-র পাশে বসবাস করত, যারা মুসলমানদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর আক্রমণ করে তাদের সমস্ত মালামাল ছিনিয়ে নিয়েছিল। এই নৈরাজ্যবাদী দলের চালিকাশক্তি ছিল এক বৃদ্ধা নারী, যার নাম ছিল উম্মে কিরফা। সে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। এই মহিলা যখন এ যুদ্ধে আটক হয় তখন যায়েদের দলের কায়েস নামের এক ব্যক্তি এই মহিলাকে হত্যা করে। ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ এই হত্যার ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন যে, তার দুই পা ভিন্ন ভিন্ন দুইটি উটের সাথে বাঁধা হয় আর এরপর উটগুলোকে বিপরীত দিকে হাঁকানো হয়, যার ফলে এই মহিলা মাঝখান থেকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। আর এরপর এই বৃদ্ধা নারীর মেয়েকে সালামা বিন আকওয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনাই কিছুটা সংক্ষিপ্ত পরিসরে ও ভিন্নভাবে ইবনে ইসহাকও বর্ণনা করেছেন।

আর এই রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে স্যার উইলিয়াম মিউর, যিনি একজন প্রাচ্যবিদ আর অন্যান্য ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকদের তুলনায় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ায় অভ্যস্ত, এই ঘটনাটিকে মুসলমানদের বর্বর মনোভাবের উদাহরণ হিসেবে একান্ত আগ্রহের সাথে নিজ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বরং স্যার উইলিয়াম মিউর এটিকে তার পুস্তকে উল্লেখের কারণই এটি বর্ণনা করেছেন যে, এই অভিযানে মুসলমানরা একটি নিষ্ঠুর কাজ করেছিল। মিউর সাহেব লেখেন:

এ বছর মুসলমানদেরকে বিভিন্ন অভিযান নিয়ে মদীনা থেকে বের হতে হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোর সব উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি বলেন, 'যদিও সেগুলোর মধ্য থেকে একটির উল্লেখ না করে আমি পারছি না, কেননা এর পরিসমাপ্তি মুসলমানদের পক্ষ থেকে একটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণের মাধ্যমে ঘটেছিল।' এটি হলো মিউর সাহেবের বর্ণনা। এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন:

যে ঐতিহাসিক একটি ঘটনাকে অন্যান্য ঘটনার ওপর প্রাধান্য দিয়ে শুধুমাত্র এই কারণে সেটিকে নিজ পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করে যে, তাতে কোনো জাতির অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রমাণ পাওয়া যায়– সে প্রকৃত অর্থে একজন নিরপেক্ষ গবেষক আখ্যায়িত হবার যোগ্য নয়। কেননা তিনি লিখেছেন, অন্যান্য ঘটনা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এই ঘটনাটিই আমি বর্ণনা করছি। এর অর্থ হলো তিনি পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন, নিরপেক্ষ গবেষক ছিলেন না। কেননা পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তির কাছে এই আশা করা যায় না, সে এই বিষয়ে গবেষণা করার প্রতি মনোযোগী হবে যে, এই অত্যাচার ও নির্যাতনের ঘটনার কোনো বাস্তবতা আছে কি না? কেননা এমনটি করলে একটি প্রমাণ তার হাতছাড়া হয়ে যায়। যাহোক, মিউর সাহেব এই ঘটনাটিকে বিশেষ আগ্রহের সাথে নিজ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন, কিন্তু আমি এখন প্রমাণ করব আর এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই ঘটনা সম্পূর্ণ

ভ্রান্ত ও পুরোপুরি ভিত্তিহীন, আর যৌক্তিক ও বর্ণনা বা রেওয়ায়েতগত– উভয় দিক থেকে এর বানোয়াট হওয়া প্রমাণিত।

যৌক্তিক দিক থেকে এটি জানা থাকা উচিত, একজন মহিলাকে, যার ওপর হত্যার অপরাধ প্রমাণিত নয়, বন্দি করে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা আর হত্যাও এত নির্দয়ভাবে করা যেমনটি এই রেওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে, এটি তো অনেক দূরের বিষয়! ইসলাম তো খোদ যুদ্ধক্ষেত্রেও নারীদের হত্যা করতে কঠোরভাবে বারণ করে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বহুবার স্পষ্ট করেছেন যে, নারীদের হত্যা করবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো এক শত্রুপক্ষের জনৈক মহিলাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন যদিও একথা জানা ছিল না যে, এই মহিলা কোন পরিস্থিতিতে এবং কার হাতে নিহত হয়েছে, তথাপি মহানবী (সা.) তাকে দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। আর সাহাবীদের দৃঢ়ভাবে বলেন, আগামীতে যেন এমন কাজ সংঘটিত না হয়; কোনো মহিলাকে হত্যা করা যাবে না। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) যখনই কোনো সেনাদল প্রেরণ করতেন তখন অন্যান্য উপদেশের পাশাপাশি সাহাবীদেরকে এই উপদেশও প্রদান করতেন যে, কোনো নারী ও শিশুকে হত্যা করবে না।

এসব নীতিগত নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সাহাবীদের সম্পর্কে, তা-ও আবার হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র মতো সাহাবী সম্পর্কে, যিনি বলতে গেলে মহানবী (সা.)-এর পরিবারেরই সদস্য ছিলেন– এই ধারণা করা যে, তিনি কোনো নারীকে এভাবে হত্যা করেছেন বা করিয়েছেন যেমনটি ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন– এটি কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যদিও রেওয়ায়েতে হত্যার জন্য যায়েদকে দায়ী করা হয় নি, বরং অন্য এক মুসলমানকে দায়ী করা হয়েছে; কিন্তু যেহেতু এই ঘটনা যায়েদের নেতৃত্বে ঘটেছে তাই এর চূড়ান্ত দায়ভার অবশ্যই যায়েদের ওপরই বর্তাবে। যায়েদ সম্পর্কে এই ধারণা করা যে, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তিনি এ ধরনের কাজের অনুমতি দিয়ে থাকবেন– (তা) আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। নিঃসন্দেহে কোনো নারী যদি কোনো অপরাধ করে সে তার অপরাধের শাস্তি পাবে। আর কোনো ধর্মের বিধান কিংবা কোনো দেশের আইন নারীকে অপরাধের শাস্তির ঊর্ধ্বে ঘোষণা করে নি। প্রায়শ নারীদের শাস্তি (হচ্ছে), বরং হত্যার অপরাধে ফাঁসি দেবার ঘটনাও (সংবাদপত্রে) প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র ধর্মীয় শত্রুতার কারণে অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে কোনো নারীকে হত্যা করা, তদুপরি এই রেওয়ায়েতে বর্ণিত রীতিতে হত্যা করা এমন একটি (গর্হিত) কাজ যাকে মহানবী (সা.)-এর নীতিগত শিক্ষা এবং সমগ্র ইসলামী ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে। যদি বলা হয়, এই মহিলা অপরাধী ছিল; আর যেমনটি বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, সে মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল; এজন্য তাকে আইনগতভাবেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বৈধ ছিল– সেক্ষেত্রে এই যুক্তি যথার্থ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সাহাবীরা যেখানে উম্মে কিরফার চেয়েও কঠোর এবং অধিক রক্তপিপাসু শত্রুদের, এমনকি পুরুষ শত্রুদেরও কখনো এভাবে হত্যা করেন নি, সেক্ষেত্রে এই ধারণা করা যে, যায়েদ বিন হারেসার মতো (একজন) বিজ্ঞ সাহাবীর নেতৃত্বে এক বৃদ্ধা নারীর সাথে এমন (নিষ্ঠুর) আচরণ করা হয়ে থাকবে– (তা) কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কাজেই যৌক্তিকভাবে এই ঘটনাটির মিথ্যা ও বানোয়াট হওয়া সবার কাছে সুস্পষ্ট, আর কোনো বিদ্বেষমুক্ত মানুষ এতে সন্দেহের অবকাশ খুঁজে পেতে পারে না।

বাকি রইল রেওয়ায়েত সংক্রান্ত দিক; এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হলো, ইবনে সা'দ ও ইবনে ইসহাক এই রেওয়ায়েতের কোনো সনদ দেন নি। কোনো ধরনের নির্ভরযোগ্য সনদ

ব্যতীত এই ধরনের রেওয়ায়েত যা মহানবী (সা.)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং সাহাবীদের সাধারণ ও পরিচিত পদ্ধতির পরিপন্থি হয় তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, এই ঘটনাটিই হাদীসের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সহীহ্ মুসলিম এবং সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু এতে ঘুণাক্ষরেও উম্মে কিরফার নিহত হবার কথা উল্লেখ নেই। অন্যান্য বিশদ বিবরণেও ইবনে সা'দ প্রমুখের বক্তব্যের সাথে বিরোধ রয়েছে। সহীহ্ হাদীস যেহেতু সাধারণ ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত থেকে নিশ্চিতরূপে নির্ভরযোগ্য ও প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য, তাই সহীহ্ মুসলিম এবং সুনানে আবু দাউদের রেওয়ায়েতের বিপরীতে ইবনে সা'দ প্রমুখের রেওয়ায়েত কোনো মূল্য রাখে না। এই পার্থক্য আরো সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যদি আমরা এ বিষয়কে দৃষ্টিপটে রাখি যে, যেখানে ইবনে সা'দ ও ইবনে ইসহাক তাদের রেওয়ায়েতে সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছে, সেখানে ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ তাদের রেওয়ায়েতগুলোর পূর্ণ সনদ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া হাদীস বিশারদদের সাবধানতার বিপরীতে, যারা (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে) পরম সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, ঐতিহাসিকদের সাধারণ রেওয়ায়েত কোনো মূল্যই রাখে না।

সহীহ্ মুসলিম আর সুনানে আবু দাউদে এই ঘটনা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, এতে উম্মে কিরফার নিহত হবার কথা পর্যন্ত উল্লেখ নেই। মুসলিম ও আবু দাউদের রেওয়ায়েতে উম্মে কিরফার নাম কোথাও উল্লেখ নেই আর দলনেতার নাম যায়েদের পরিবর্তে আবু বকর লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এ কারণে এটি অন্য কোনো অভিযান বলে সন্দেহ করা যাবে না, কেননা বাকি সকল গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ এক ও অভিন্ন। যেমন দুইটি রেওয়ায়েতেই এটি সুস্পষ্ট যে, এই অভিযান বনু ফাযারার বিরুদ্ধে ছিল।

দ্বিতীয়ত, উভয় বর্ণনায় এটি উল্লেখ আছে যে, বনু ফাযারার সর্দার ছিল একজন বৃদ্ধা নারী। উভয় বর্ণনায় এই নারীকে বন্দি করার উল্লেখ রয়েছে। আবার উভয় বর্ণনায় এটিও উল্লেখ রয়েছে, এই নারীর একটি কন্যাও ছিল, যে মায়ের সাথে বন্দি হয়েছিল। এছাড়া উভয় বর্ণনায় এটিও উল্লেখ রয়েছে, এই মেয়েটি সালামা বিন আকওয়ার ভাগে এসেছিল।

এছাড়া আরো অনেক বিষয়ে মিল বা সামঞ্জস্য রয়েছে। এবার প্রণিধান করুন, এই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি কি সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে যে, এই দুটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা? কিন্তু আমরা শুধুমাত্র যৌক্তিক প্রমাণের ওপরই নির্ভর করছি না, বরং অতীতের গবেষকরাও স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, সহীহ্ মুসলিম এবং সুনানে আবু দাউদে সেই ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে যা ইবনে সা'দ ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন। যেমন, আল্লামা যুরকানী, ইমাম সুহায়েলী এবং আল্লামা হালাবী সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, এটি সেই ঘটনাই যা ইবনে সা'দ এবং ইবনে ইসহাক উম্মে কিরফার ঘটনায় ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন। তবে এটিই যে সেই ঘটনা, একথার চেয়েও তার বড়ো প্রমাণ হলো, তাবারী এই উভয় রেওয়ায়েতকে পাশাপাশি উল্লেখ করে স্পষ্ট করেছেন যে, এই দুটি একই ঘটনা।

মোটকথা, এই বিষয়টি একেবারে সুনিশ্চিত যে, মুসলিম এবং আবু দাউদে বর্ণিত সালামা বিন আকওয়ার রেওয়ায়েতে সেই ঘটনাই বর্ণনা করা হয়েছে যেটি ইবনে সা'দ এবং ইবনে হিশাম উম্মে কিরফার যুদ্ধাভিযান নামে ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেহেতু সিহাহ্-র রেওয়ায়েত (অর্থাৎ হাদীসের যে ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে;) সেগুলোর রেওয়ায়েত যা সনদসহ বর্ণনা করা হয়েছে এবং ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত এক ব্যক্তির ভাষায় বর্ণিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ইবনে সা'দ এবং ইবনে হিশামের অনির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের চেয়ে (বেশি) গ্রহণযোগ্য। কাজেই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, উম্মে কিরফার

অমানবিক হত্যার ঘটনা একটি নিতান্তই বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন ঘটনা, যা ইসলামের কোনো অজ্ঞাত শত্রু এবং মুনাফিকদের সহায়তায় কোনো কোনো ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে অনুপ্রবেশ করেছে। আসল সত্য হলো, এই যুদ্ধাভিযানের প্রকৃত ঘটনা এর চেয়ে বেশি কিছু নয় যা মুসলিম এবং আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, কোনো ভুল ঘটনা ইতিহাসে অনুপ্রবেশ করতে পারে, কেননা এ ধরনের দৃষ্টান্ত সকল জাতি এবং সকল দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তবে এটি অবশ্যই এক বিস্ময়কর ব্যাপারে যে, স্যার উইলিয়াম-এর মতো মানুষ এই ভুল ঘটনাকে কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই নিজের গ্রন্থে স্থান দেবেন এবং প্রকাশ্যে এই বিষয়টি স্বীকার করবেন যে, এটি লিপিবদ্ধ করার একমাত্র কারণ হলো, এর মাধ্যমে মুসলমানদের একটি পাশবিক কর্মের প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাহোক, এটি ঘটনাটিই ভুল; এটি এভাবে ঘটে নি।

ইতিহাসে সারিয়্যা আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, যা আবু রাফে'র বিরুদ্ধে (পরিচালিত) হয়েছিল। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, এই যুদ্ধাভিযান ৬ষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে পরিচালিত হয়। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থের আলোকে নিজের যে গবেষণাকর্ম তুলে ধরেছেন তা হলো, আবু রাফে'র হত্যার সময়কাল সম্পর্কিত বিভিন্ন রেওয়ায়েতে মতভেদ রয়েছে। ইমাম বুখারী, যুহরীর অনুসরণে নির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ না করে এটিকে শুধু কা'ব বিন আশরাফের হত্যার পরের (ঘটনা) হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা অবশ্যই সঠিক। সম্ভবত এই ঘটনাগুলোকে একসাথে উল্লেখ করার কারণ হলো, এগুলোর ধরন একই রকম। তাবারী একে তৃতীয় হিজরীতে কা'ব বিন আশরাফের (হত্যার) ঘটনার পরে উল্লেখ করেছেন। ওয়াকদী চতুর্থ হিজরীতে উল্লেখ করেছেন। ইবনে হিশাম, ইবনে ইসহাকের বরাতে একে বনু কুরায়যার যুদ্ধের পরে বলে উল্লেখ করেছেন যা পঞ্চম হিজরীর শেষাংশে সংঘটিত হয়েছিল এবং এভাবে এটিকে ৬ষ্ঠ হিজরীর প্রারম্ভেও হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু ইবনে সা'দ এটিকে স্পষ্টভাবে ৬ষ্ঠ হিজরী বলে উল্লেখ করেন আর সাধারণ ইতিহাসবিদরা ইবনে ইসহাকের অনুসরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, পরিখা এবং বনু কুরায়যার যুদ্ধ যখন শেষ হয় আর সালাম বিন আবিল হুকায়েক অর্থাৎ আবু রাফে' সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা মহানবী (সা.) বিরুদ্ধে সৈন্য সমারোহ করেছিল। আর অওস গোত্র উহুদ যুদ্ধের পূর্বে কা'ব বিন আশরাফ নামক ইহুদীকে মহানবী (সা.)-এর সাথে শত্রুতার জেরে এবং তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে উস্কানি দেবার কারণে হত্যা করেছিল, তখন খাযরাজ গোত্র মহানবী (সা.)-এর নিকট সালাম বিন আবিল হুকায়েককে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করে। সেসময় সে খায়বারে ছিল। তিনি (সা.) তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেন। এই উভয় গোত্র অর্থাৎ অওস এবং খাযরাজ মহানবী (সা.)-এর দরবারে পুণ্যের ক্ষেত্রে দুটি তাগড়া উটের ন্যায় প্রতিযোগিতা করত। অওস গোত্র মহানবী (সা.)-এর জন্য কোনো কাজ করলে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বলত, এরা তো এই কাজের কারণে মহানবী (সা.)-এর নৈকট্যভাজন হবে এবং ইসলামে আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাবে! সুতরাং তারা যতক্ষণ তাদের সমপরিমাণ কোনো কাজ না করে দেখাতো, ততক্ষণ ক্ষান্ত হতো না। আর খাযরাজ গোত্র যদি এমন কোনো কাজ করত তাহলে অওস গোত্রও তাদের অনুরূপ কিছু করত। অওস গোত্রের লোকেরা যখন মহানবী (সা.)-এর সাথে শত্রুতার কারণে কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করে তখন খাযরাজ বলতে থাকে যে, অওস গোত্র এ কারণে কখনো আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না। তারা সেসব কাজে প্রতিযোগিতা করত যা

তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নিকটবর্তী করে। তখন তারা গভীর চিন্তাভাবনা করে যে, কোন সে ব্যক্তি– যে মহানবী (সা.)-এর শত্রুতায় কা'ব বিন আশরাফের সমকক্ষ হবে? তখন ইবনে আবিল হুকায়েকের কথা তাদের স্মৃতিপটে জাগ্রত হয় যে তখন খায়বারে অথবা হিজাযে বসবাস করছিল। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, খাযরাজ গোত্র বলে, আবু রাফে' বিন হুকায়েক গাতাফান গোত্র এবং তার আশপাশের মুশরিকদের একত্রিত করেছে আর মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনেক বড়ো ভাতার ঘোষণা প্রদান করেছে। অতঃপর খাযরাজ গোত্র মহানবী (সা.)-এর নিকট তাকে (অর্থাৎ আবিল হুকায়েককে) হত্যা করার অনুমতি চায়। মহানবী (সা.) তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেন। এভাবে খাযরাজের মধ্য থেকে বনু সালামার পাঁচ ব্যক্তি– আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক, মাসউদ বিন সিনান, আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়স জুহনি– যিনি আনসারদের মিত্র ছিলেন, আবু কাতাদা হারেস বিন রবী এবং খাযায়ি বিন আসওয়াদ বের হন। মুহাম্মদ বিন উমর এবং ইবনে সা'দ-এর মতে, আসলাম গোত্রের আসওয়াদ বিন খাযায়ি আনসারদের মিত্র ছিল। আর বারা বিন আযেব, আব্দুল্লাহ্ বিন উতবার নামও উল্লেখ করেন যেভাবে সহীহ বুখারীতে উল্লেখিত রয়েছে। এভাবে ছয় ব্যক্তি হয়। ইবনে উকবা এবং সুহেলি আসাদ বিন হারামের নামও যোগ করেন আর এভাবে তারা সাত ব্যক্তি হলেন। মহানবী (সা.) তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আতিককে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন আর তাদেরকে নারী ও শিশুদের হত্যা করতে বারণ করেন।

দেখুন! এখানেও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তিনি (সা.) বলেন, মহিলাদের হত্যা করবে না। সহীহ বুখারীতে আবু রাফে'কে হত্যা করার বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে উল্লেখ রয়েছে:

হযরত বারা বিন আযেব বর্ণনা করেন, আবু রাফে' মহানবী (সা.)-কে অনেক কষ্ট দিত আর মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে শত্রুদের সে সাহায্য করত। সে হিজাযের ভূমিতে অবস্থিত নিজ দুর্গে বসবাস করত। তারা যখন তার (অর্থাৎ আবু রাফে'র) নিকটে পৌঁছায় তখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল। আর মানুষ নিজেদের গবাদি পশুর পাল নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক তার সাথিদের বলেন, তোমরা নিজেদের জায়গায় অবস্থান করো, আমি যাচ্ছি; দারোয়ানের সাথে কোনো কৌশল অবলম্বন করে ভেতরে প্রবেশ করব। তিনি যান এবং দরজার কাছে পৌঁছেন। তখন তিনি নিজেকে কাপড়াবৃত করেন যেন তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। লোকজন সবাই ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক বলেন, আমি দুর্গে প্রবেশ করার চেষ্টায় কোনো কৌশল খুঁজছিলাম; তখন দুর্গের লোকেরা বুঝতে পারে যে, তাদের একটি গাধা পাওয়া যাচ্ছে না। তখন তারা আলো নিয়ে তা খুঁজতে বের হয়। তিনি বলেন, আমার আশঙ্কা হলো, পাছে তারা আমাকে চিনে ফেলে। সেই সাহাবী বলেন, আমি আমার মাথা ঢেকে ফেলি, যেন আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছি। বুখারীর বর্ণনা এটি। দারোয়ান তাকে ডেকে বলে, হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি যদি প্রবেশ করতে চাও তাহলে প্রবেশ করো, আমি দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছি। এরপর আমি ভিতরে ঢুকেই লুকিয়ে পড়ি। অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে, আমি ভিতরে প্রবেশ করে দুর্গের ভেতর গাধা বাঁধার জায়গায় আত্মগোপন করি। মানুষজন যখন ভিতরে প্রবেশ করে তখন সে দরজা বন্ধ করে আর দরজার চাবি একটি পেরেকের গায়ে ঝুলিয়ে রাখে। তিনি বলেন, আমি উঠে চাবি রাখার স্থানে যাই এবং সেটি নিয়ে দরজা খুলে দেই। একটি বর্ণনায় রয়েছে, যখন সর্বত্র নিস্তব্ধতা ছেয়ে যায় এবং আমি কোনো সাড়াশব্দ টের পেলাম না– তখন বাইরে আসি। তিনি বলেন, দারোয়ান একস্থানে তাকের ওপর যখন দুর্গের চাবি রেখেছিল, আমি তা লক্ষ্য করেছি। এটিও বুখারীর বর্ণনা। মানুষ আবু রাফে'র সাথে

রাতে গল্পগুজব করত। সে আসর বসাতো এবং নিজের বালাখানায় ছিল। লোকেরা যখন তার কাছ থেকে চলে গেল; [তিনি বলেন, আমি নজর রাখছিলাম, আসরে মত্ত লোকেরা যখন চলে গেল;] একটি রেওয়ায়েতে এটিও আছে যে, লোকেরা আবু রাফে'র সাথে বসে রাতের খাবার খেল এবং তারা আড্ডা জমিয়ে তুলল, এমনকি রাতের এক প্রহর অতিবাহিত হয়ে গেল, এরপর তারা নিজ নিজ গৃহে ফেরত যায়। এটিও সহীহ বুখারীর বর্ণনা। আমি তার সিঁড়ি বেয়ে উঠি আর যে দরজাই আমি খুলতাম তা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতাম। আমি মনস্থির করলাম, মানুষ যদি আমার শব্দ টের পেয়েও যায় তবুও আমি তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমার কাছে তারা পৌঁছতে পারবে না। অপর এক রেওয়ায়েতের ভাষ্য হলো, আমি তার কাছে পৌঁছলাম, অতঃপর আমি তার ঘরের দরজার দিকে গেলাম এবং সেটিকে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম। এরপর একটি সিঁড়িতে উঠে আমি আবু রাফে'র নিকট পৌঁছলাম। এটিও বুখারীর বর্ণনা। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, সে একটি অন্ধকার কক্ষে পরিবারের সাথে শুয়ে আছে। আমার জানা ছিল না, কক্ষের কোথায় সে অবস্থান করছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আবু রাফে'! সে বলে, কে? যে–দিক থেকে শব্দ আসে আমি অনুমান করে সেদিকে যাই। আমি তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করি। আর আমি ভীতত্রস্ত [অর্থাৎ উত্তেজনায় ঘাবড়ে] ছিলাম, তাই আঘাতটি তেমন জুতসই হয় নি। সে চিৎকার করে ওঠে। [সঠিকভাবে আঘাত লাগে নি আর সে চিল্লাপাল্লা আরম্ভ করলে।] তখন আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি পুনরায় তার কাছে যাই; বুঝালাম যে, আমি তার সাহায্যের জন্য এসেছি আর বলি, আবু রাফে'! এই চেঁচামেচি কীসের? আমি আমার কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে বলি। আবু রাফে' বলে, তুমি ধ্বংস হও! এ কক্ষে কোনো ব্যক্তি আছে যে কিছুক্ষণ পূর্বে তরবারি দিয়ে আমার ওপর আক্রমণ করেছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক বলেন, তারপর আমি তাকে আরেকবার আঘাত করি, অর্থাৎ তার গলার শব্দ শুনে (অবস্থান আঁচ করে) তাকে আঘাত করি যা তাকে রক্তাক্ত করে দেয়। কিন্তু তখনো আমি তাকে হত্যা করতে পারি নি। এরপর তরবারির ধারালো প্রান্ত তার পেটে ঢুকিয়ে দেই, যার ফলে তা তার পিঠ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

অপর একটি রেওয়ায়েতে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করার ঘটনা এভাবে পাওয়া যায়: তারপর আমি পুনরায় তার দিকে যাই এবং তাকে আরেকবার আঘাত করি, কিন্তু তাতেও কাজ হয় নি। সে চিৎকার করল এবং তার পরিবারের লোকজন উঠে দাঁড়াল। তিনি বলেন, এরপর আমি আসি এবং আমি সাহায্যকারীর ন্যায় নিজের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করি। [অর্থাৎ দ্বিতীয় বার কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে যান।] দেখি যে, সে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। আমি তরবারি তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেই এবং তার ওপর ঝুঁকে যাই, এমনকি আমি হাড় ভাঙার শব্দ শুনতে পাই। এটিও বুখারীর রেওয়ায়েত। আমি নিশ্চিত হই যে, আমি তাকে হত্যা করেছি। অতঃপর আমি একে একে দরজা খুলি, এভাবে শেষ সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাই। আমি (সিঁড়িতে) আমার পা রাখলাম আর মনে করলাম, মাটি পর্যন্ত পৌঁছে গেছি, কিন্তু আমি পড়ে গেলাম। [সেটি সর্বশেষ সিঁড়ি ছিল না, বরং সম্ভবত আরো দুই-তিনটি সিঁড়ি বাকি ছিল, ফলে পড়ে গিয়ে থাকবেন।] সেই পূর্ণিমা রাতে আমার পায়ের নলা ভেঙ্গে যায়।

আরেক বর্ণনায় আছে যে, আমার পায়ের অস্থিসন্ধি খুলে যায়। আমি সেটি পাগড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলি। এরপর হেঁটে গিয়ে অবশেষে দরজায় বসে পড়ি এবং ভাবতে থাকি, আজ রাতে (ততক্ষণ) বাইরে বের হব না যতক্ষণ আমি নিশ্চিত না হচ্ছি, আমি তাকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছি কি না? প্রভাতে যখন মোরগ ডাকল, [মোরগ যেভাবে প্রভাতে ডাকে সেভাবে

ডাকা শুরু করল;] তখন মৃত্যুর ঘোষণা প্রদানকারী (ঘোষক) প্রাচীরের ওপর দাঁড়াল আর বলতে লাগল, 'হিজাযের ব্যাবসায়ীর মৃত্যুর খবর জানাচ্ছি'। তখন আমি বললাম, আমরা মুক্তি পেলাম। আল্লাহ্ তা'লা আবু রাফে'কে ধ্বংস করেছেন।

এরপর মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছলাম এবং ঘটনার বিবরণ শোনালাম। তিনি (সা.) আমাকে বললেন, তোমার পা সামনে এগিয়ে দাও। আমি পা এগিয়ে দিলে তিনি (সা.) তাতে হাত বুলিয়ে দিলেন, ফলে আমার এমন মনে হলো যেন আমি কোনো ব্যথাই পাই নি।

অন্য আরেক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক বর্ণনা করেছেন: আমি আমার সাথিদের কাছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, যাও এবং (তোমরাই) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সুসংবাদ দাও। কেননা আমি ততক্ষণ পর্যন্ত যেতে পারব না যতক্ষণ মৃত্যুর ঘোষণা প্রদানকারীর আওয়াজ আমার কানে এসে না পৌঁছে। সকাল হবার পূর্ব মুহূর্তে মৃত্যুর সংবাদবাহক দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'আবু রাফে'র মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছি'। আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক বলতেন, আমি যখন উঠে হাঁটা আরম্ভ করলাম তখন আমার কোনো ব্যথাই অনুভূত হচ্ছিল না। ফলে তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছার পূর্বেই আমি আমার সাথিদের ধরে ফেললাম। [অর্থাৎ এরূপ একটি বর্ণনাও রয়েছে যে, পূর্বেই তার পা মচকানোর কষ্ট দূর হয়ে গিয়েছিল।]

এই ঘটনা ইমাম বুখারী হযরত বারা বিন আযেব (রা.)-র বরাতে বর্ণনা করেছেন আর এতে এ বর্ণনা রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক একক প্রচেষ্টায় আবু রাফে'কে হত্যা করেছিলেন; কিন্তু ইবনে উকবা, ইবনে ইসহাক, মুহাম্মদ বিন উমর এবং ইবনে সাদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ বিন আতিকের সাথে অন্য সাথিরাও ছিল যারা সম্মিলিতভাবে (আবু রাফে'কে) হত্যা করেছিলেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এই ঘটনার পর্যালোচনা করেছেন আর এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) লেখেন, যে সমস্ত ইহুদী নেতার নৈরাজ্য, প্ররোচনা এবং উসকানির ফলে পঞ্চম হিজরীর শেষের দিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিখার যুদ্ধের ন্যায় ভয়ংকর নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মাঝে হুয়ী বিন আখতাব তো বনু কুরায়যার সাথে অপরাধের শাস্তি পেয়ে স্বীয় পরিণতি প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্তু সালাম বিন আবিল হুকায়েক, যার উপনাম ছিল আবু রাফে', সে তখনও খায়বার এলাকায় লাগামহীন কার্যকলাপ ও নৈরাজ্যকর কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত ছিল। বরং পরিখার লাঞ্ছনাজনক ব্যর্থতা এবং বনু কুরায়যার ভয়ংকর পরিণতি তার বিদ্বেষ আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর যেহেতু গাতাফানের বসতি খায়বারের কাছাকাছি ছিল আর খায়বারের ইহুদী এবং নাজদের গোত্রগুলো পরস্পর প্রতিবেশী ছিল, তাই আবু রাফে'– যে অনেক বড়ো একজন ব্যাবসায়ী এবং বিরাট ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল– সে নাজদের বর্বর ও যুদ্ধবাজ গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়াকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করেছিল। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শত্রুতায় সে ছিল কা'ব বিন আশরাফের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি।

অতএব সেই যুগে যার উল্লেখ করা হচ্ছে, সে গাতাফানবাসীদের প্রচুর সম্পদ দিয়ে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে সাহায্য করেছিল। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, শাবান মাসে বনু সা'দের পক্ষ থেকে মুসলমানরা যে (হামলার) আশঙ্কা করছিল আর যা প্রতিহত করতে হযরত আলী (রা.)-র নেতৃত্বে একটি সেনাদল মদীনা থেকে যাত্রা করেছিল– সেটির নেপথ্যেও খায়বারের ইহুদীদের হাত ছিল যারা আবু রাফে'র নেতৃত্বে এ দুষ্কৃতি করে যাচ্ছিল। কিন্তু আবু রাফে' কেবল এতেই ক্ষান্ত হয় নি। মুসলমানদের রক্ত দিয়ে সে তার

অতৃপ্ত পিপাসা নিবারণ করতে চাইত, তাছাড়া মহানবী (সা.)-এর সত্তা ছিল তার চক্ষুশূল। যাহোক, পরিশেষে সে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে পরিখার যুদ্ধের ন্যায় নাজদের গোত্র গাতাফান এবং অন্যান্য গোত্রগুলোর মাঝে পুনরায় সফর করা শুরু করে আর মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য বিরাট এক সেনাদল একত্রিত করা শুরু করে। [উহুদের যুদ্ধের পর সে পুনরায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে একটি দল গঠন করা শুরু করে।] অবস্থা যখন এই পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় আর মুসলমানদের সম্মুখে সেই আহযাবের দৃশ্য ভেসে ওঠে তখন খাযরাজ গোত্রের কতিপয় আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় আর নিবেদন করে, এই নৈরাজ্য নির্মূলের ক্ষেত্রে যে–কোনো উপায়ে এই নৈরাজ্যের মূল হোতা আবু রাফে'কে হত্যা করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। [এটিই একমাত্র উপায়।] মহানবী (সা.) ভাবলেন, দেশে ব্যাপক রক্তারক্তি ও খুনোখুনির বদলে এক নৈরাজ্যবাদী ব্যক্তির নিহত হওয়া অধিক সমীচীন। ফলে এ সাহাবীদের তিনি (সা.) অনুমতি প্রদান করেন। আর আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক আনসারী সাহাবীর নেতৃত্বে চারজন খাজরাযী সাহাবীকে আবু রাফে'র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু যাত্রাকালে তাদেরকে কড়া নির্দেশনা দিয়ে বলেন, সাবধান! কোনো নারী বা শিশুকে কোনো অবস্থাতেই হত্যা করবে না। [পুনরায় এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। সেক্ষেত্রে এ কথা কীভাবে বিশ্বাসযোগ্য যে, সেখানে মহিলাকে হত্যা করেছেন?]। ৬ষ্ঠ হিজরী সনের রমযান মাসে এই দল যাত্রা করে আর অতি সাবধানতার সাথে নিজেদের কার্য সম্পাদন করে ফিরে আসে। এভাবে এই নৈরাজ্যের মেঘমালা মদীনার আকাশ থেকে দূরীভূত হয়।

এই ঘটনাটি বিস্তারিত বিবরণ বুখারীতে রয়েছে যা সবচেয়ে সঠিক রেওয়ায়েত। পূর্বেও আমি তা শুনিয়েছি, এটি তিনি নিজের মতো করে এখানে বর্ণনা করেছেন।

বারা বিন আযেব বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদের একটি দল ইহুদী আবু রাফে'র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক আনসারীকে তাদের দলপতি নিযুক্ত করে দেন। আবু রাফে'র বিষয়টি হলো, সে মহানবী (সা.)-কে ভীষণ কষ্ট দিতো। আর তাঁর বিরুদ্ধে মানুষকে উসকানি দিতো এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতো। যখন আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক এবং তার সঙ্গীগণ আবু রাফে'র দুর্গের নিকট পৌঁছলেন, তখন সূর্য অস্তমিত হলো। আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক (রা.) নিজ সঙ্গীদেরকে রেখে নিজে দুর্গের দরজার নিকট আসলেন এবং সেখানে এমনভাবে চাদরমুড়ি দিয়ে বসে পড়লেন যেন কোনো ব্যক্তি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য বসেছে। যখন দুর্গের ফটকের দারোয়ান দরজার নিকট এলো তখন আব্দুল্লাহ্ বিন আতিককে দেখে বললো, ওহে! আমি এখন দুর্গের ফটক বন্ধ করে দেবো, তুমি ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে দ্রুত প্রবেশ করো। আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক ভালোভাবে চাদরমুড়ি দিয়ে ফটক পেরিয়ে দ্রুত দুর্গে প্রবেশ করেন এবং একপাশে আত্মগোপন করেন। আর ফটকের দারোয়ান ভেতর থেকে ফটক বন্ধ করে সেটির চাবি কাছাকাছি একটি আংটাতে ঝুলিয়ে রেখে চলে যায়।

(আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক স্বয়ং বর্ণনা করেন,) এরপর আমি আমার লুকানোর স্থান থেকে বেরিয়ে পড়ি এবং সবার আগে আমি দুর্গের ফটকটি খুলে দেই যেন প্রয়োজনের সময় দ্রুত এবং সহজেই বেরিয়ে আসা যায় সম্ভব হয়। সেই সময় আবু রাফে' একটি বালাখানায় অবস্থান করছিল। [উপরে তার ঘরের মেঝেতে বসে ছিল, কামরায় ছিল;] এবং তার আশেপাশে অনেক লোক আসর জমিয়ে বসে ছিল আর পরস্পর আলাপচারিতায় মত্ত ছিল। যখন এরা উঠে চলে গেল এবং নীরবতা ছেয়ে গেল তখন আমি আবু রাফে'র বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওপরের তলায় উঠে গেলাম এবং অধিক সতর্কতাবশত পথিমধ্যে যে দরজাই পাচ্ছিলাম, ভেতরে প্রবেশ করে

ভেতর থেকে বন্ধ করে দিচ্ছিলাম। যখন আমি আবু রাফে'র কক্ষে পৌঁছলাম, তখন সে প্রদীপ নিভিয়ে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল আর কক্ষটি একেবারে অন্ধকার ছিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে আবু রাফে'কে ডাকলাম। এর উত্তরে সে বললো, কে? তার কণ্ঠস্বরের দিকটি অনুমান করে সেদিকে ছুটে যাই এবং তরবারি দিয়ে মারাত্মক এক আঘাত করি। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল আর সেই সময় আমি বিচলিত ছিলাম, তাই তরবারির আঘাত সঠিক জায়গায় লাগে নি। তখন আবু রাফে' চিৎকার করে ওঠে। এতে আমি কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আমি পুনরায় কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করে নিজের গলার স্বর পরিবর্তন করে জিজ্ঞেস করলাম, আবু রাফে'! এটা কীসের শব্দ? সে আমার পরিবর্তিত গলার স্বর চিনতে না পেরে বললো, তোমার মরণ হোক! এইমাত্র কেউ আমার ওপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করেছে। আমি আওয়াজ শুনে পুনরায় তার দিকে ছুটলাম এবং তরবারি দিয়ে আক্রমণ করলাম। এইবার আঘাত মোক্ষম ছিল, কিন্তু তবুও সে মারা গেল না। তখন আমি তার ওপর তৃতীয়বার আক্রমণ করে তাকে হত্যা করলাম। এরপর আমি দ্রুত একের পর এক দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু যখন আমি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলাম তখন কয়েক ধাপ অবশিষ্ট ছিল; আমি ভেবেছিলাম, আমি সব ধাপ নেমে গেছি, ফলে আমি অন্ধকারে পড়ে গেলাম। বেকায়দায় পা পড়ল এবং আমার পায়ের নলা ভেঙে গেল। একটি রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে, নলার অস্থিসন্ধি বেরিয়ে আসলো। আমি সেটিকে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে পা হেঁচড়ে বেরিয়ে আসলাম, কিন্তু আমি মনে মনে বললাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আবু রাফে'র মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত না হচ্ছি আমি এখান থেকে যাব না। আমি দুর্গের পাশেই এক স্থানে লুকিয়ে বসে পড়লাম। যখন ভোর হলো তখন দুর্গের ভেতর থেকে কারো আওয়াজ আমার কানে আসলো, হিজাযের ব্যাবসায়ী আবু রাফে' মৃত্যু বরণ করেছে।

এরপর আমি উঠলাম এবং ধীর পদক্ষেপে নিজ সঙ্গীদের সাথে মিলিত হলাম। অতঃপর আমরা মদীনাতে এসে মহানবী (সা.)-কে আবু রাফে'র নিহত হবার সংবাদ দিলাম। তিনি (সা.) পুরো ঘটনা শুনে আমাকে বললেন, নিজ পা সামনে বাড়াও। আমি পা বাড়ালে তিনি (সা.) দোয়া করে নিজের হাত বোলালেন, এরপর আমার মনে হলো, আমি যেন কোনো আঘাতই পাই নি।

অপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যখন আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক (রা.) আবু রাফে'র ওপর আক্রমণ করলেন তখন তার স্ত্রী জোরে চিৎকার দেওয়া শুরু করে। এতে আমার আশঙ্কা হয়, তার চিৎকার শুনে আবার অন্য লোকেরা সতর্ক না হয়ে পড়ে। এতে আমি তার স্ত্রীর ওপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে মহানবী যে নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন সেকথা আমার মনে পড়ল। [এখানেও একই কথা হচ্ছে যে, নারীদের হত্যা করা নিষেধ।] তিনি বলেন, সেজন্য আমি তরবারি দিয়ে আঘাত করি নি, অথচ খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি ছিল।

আবু রাফে'র হত্যার বৈধতার বিষয়ে আমাদের এখানে কোনো বিতর্কে লিপ্ত হবার প্রয়োজন নেই। আবু রাফে'র রক্তক্ষয়ী কর্মকাণ্ড ইতিহাসের এক উন্মুক্ত অধ্যায়। নীতিগতভাবে মনে রাখা উচিত:

১. সে সময় মুসলমানরা অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় সর্বমুখী বিপদে পরিবেষ্টিত ছিল। সকল দিকে বিরোধীতার আগুন প্রজ্বলিত ছিল। পুরো দেশ যেন মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য সম্মিলিত হচ্ছিল।

২. এমন স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে আবু রাফে' মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত আগুনে ঘি ঢালছিল। নিজের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও অর্থসম্পদ দ্বারা আরবের বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছিল। এই বিষয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, আরবের হিংস্র গোত্রগুলো যেন আহযাবের যুদ্ধের মতো সংঘবদ্ধভাবে পুনরায় মদীনার ওপর আক্রমণ করে।

৩. সে সময় আরবে কোনো নিয়মতান্ত্রিক সরকার ছিল না যাদের কাছে সাহায্য চাওয়া যেত। বরং প্রত্যেক গোত্র নিজ স্থানে স্বাধীন ও সার্বভৌম ছিল। সেজন্য নিজ নিরাপত্তার জন্য নিজের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

৪. ইহুদীরা পূর্ব থেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ ছিল এবং ইহুদীদের ও মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধের অবস্থা বিরাজমান ছিল।

৫. সে সময় পরিস্থিতি এমন ছিল যে, ইহুদীদের বিরুদ্ধে যদি প্রকাশ্যে সৈন্য পরিচালনা করা হতো তাহলে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতো এবং যুদ্ধের আগুন সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে দেশব্যাপী ভয়ানক ধ্বংসযজ্ঞের আশঙ্কা ছিল।

এহেন পরিস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরাম যা করেছেন তা ছিল একেবারে সঠিক। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যখন একটি জাতি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা একেবারেই বৈধ মনে করা হয়। পৃথিবীর প্রতিটি জাতি প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেক যুগে এমন পন্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে অপরাধীর প্রতি সহানুভূতি এতটাই অবৈধ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, একজন নিষ্ঠুর ব্যক্তিও নায়ক হয়ে যায়। [আজও আমরা দেখি, স্বৈরশাসকও বীরে পরিণত হয়ে আছে এবং অপরাধী অপরাধের জন্য যে শাস্তি পাওয়া দরকার তা না পেয়ে মানুষের সহানুভূতি পেতে থাকে।] অন্যায়কারীর শাস্তির কথা বললে কিছু স্বার্থপর মানুষ তার পক্ষ অবলম্বন করে, তার অপরাধ মানুষ ভুলে যায়। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে আমরা জানি, ইসলাম এই ধরনের মিথ্যা আবেগ-অনুভূতির সমর্থক ধর্ম নয়। ইসলাম অপরাধীকে অপরাধী হিসেবেই আখ্যায়িত করে আর তাকে শাস্তি দেওয়া দেশ ও সমাজের জন্য মঙ্গলজনক মনে করে। ইসলাম শরীর থেকে একটি রোগাক্রান্ত অঙ্গ কেটে ফেলার শিক্ষা দেয় এবং একটি অসুস্থ অঙ্গ আরেকটি সুস্থ অঙ্গকে স্পর্শ করে কলুষিত করবে– এর অনুমতি ইসলাম দেয় না। বাকি রইল শাস্তি দেবার রীতি সম্পর্কিত প্রশ্ন; তৎকালীন আরবদের অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং তৎকালীন মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যে যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল সে প্রেক্ষিতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল, যা সামগ্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথোপযুক্ত ছিল।

আবদুল্লাহ্ বিন আতিকের পায়ের নিরাময় সম্পর্কে বুখারীর রেওয়ায়েতে ব্যাখ্যা করা হয় নি যে, এই নিরাময় কি অলৌকিকভাবে তৎক্ষণাৎ হয়েছিল নাকি স্বাভাবিক ভাবে ধীরে ধীরে তা নিরাময় হয়েছিল। যদি দ্বিতীয়টি ঘটে থাকে তাহলে এটি একটি সাধারণ ঘটনা বলে বিবেচিত হবে; সেক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর দোয়ার প্রভাব এটি সাব্যস্ত হবে যে, তাঁর (সা.) দোয়ার বরকতে এই আঘাত কোনো দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে নি এবং এর ফলে কোনো খারাপ ফলাফল প্রকাশ পায় নি; বরং হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-র পা অবশেষে পূর্ণ শক্তি ফিরে পেয়েছে এবং আঘাতের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেছে। তবে এই নিরাময়টি যদি অলৌকিক এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে থাকে তবে অবশ্যই এই ঘটনাটি খোদা তা'লার বিশেষ তকদীরের (বা মু'জিযার) দৃষ্টান্ত ছিল যা তিনি নিজ রসূলের (সা.) দোয়ার বরকতের ফলে প্রকাশ করেছেন।

যাহোক, এগুলো ছিল তার ঘটনা এবং ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ্ আরো ঘটনা উল্লেখ করা হবে।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)